বিদেশী রূপকথা

শ্রী ক্ষেমঙ্কর ঘোষ



- প্রকাশ করেছেন
  শিশু সাহিত্য প্রচার পক্ষে
  শ্রীহিরণ্ময় চক্রবর্ত্তী
  ৭।এ, রাম মোহন সাহা লেন
  কলিকাতা।
- ছবি এঁকেছেন
  শ্রীঅরুণ দাস।
- ছেপেছেন
  শ্রীসুবোধ চন্দ্র মণ্ডল
  কল্পনা প্রেস লিঃ
  ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
  কলিকাতা।
- বেঁধেছেন
  ভ্যারাইটি বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
- মূল্য—বার আনা মাত্র।

পরিবেশক

কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।



তুষার কন্যা

তখন শীতকাল। খুব শীত পড়েছে। তুষারের স্তবকগুলো মেঘথেকে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা পালখের মতো। এক রাণী রাজপুরীর জানালায় বসে তার স্বামীর একটি পোষাক সেলাই করছেন। জানালার চৌকাঠ কালো আবলুষ কাঠের।

তিনি সেলাই করছেন আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরে তুষার স্তবকগুলো দেখছেন। এমন সময়ে তাঁর আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটে গেল। অমনি সেখান থেকে তিন ফোঁটা রক্ত পড়লো তুষারের ওপর। সাদার ওপর লাল রঙ দেখতে খাশা। রাণী তা দেখে মনে মনে বললেন, "আহা আমার যদি এমন এক

সন্তান থাকতো, যার গায়ের রঙ হ'ত দুধে-আলতায় আর চুলের রঙ হ'ত ঐ আবলুষ কাঠের মতো কুচকুচে কালো।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁর একটি মেয়ে হল। তার রঙ হল দুধে-আলতায়, আর মাথার চুলগুলি হল আবলুষ কাঠের মতো কালো। তাই তার নাম রাখা হল, "তুষার-কন্যা"।

রাণীর মনের সাধ পুরলো বটে কিন্তু তারপর তিনি আর বাঁচলেন না। মেয়েটি হবার পরই মারা গেলেন।

তার বছর খানেক পরেই রাজা আবার বিয়ে করলেন। এবারকার রাণী হলেন, পরমাসুন্দরী। তা হলে কি হয়? তাঁর এমন বদমেজাজ আর দেমাক যে তাঁর চেয়ে কেউ বেশী সুন্দরী থাকবে তা তিনি সইতে পারতেন না। তাঁর একখানি আশ্চর্য আয়না ছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে রাণী যখন জিগ্যেস করতেন, "বল তো আয়না, সব চেয়ে সুন্দরী কে?"

আয়নাখানি জবাব দিত, "রাণী, তুমি।"

সে কথা শুনে রাণী ভারী খুশি-হতেন। তিনি জানতেন, তাঁর আয়নাখানি যা বলে, তা সত্যি।

এদিকে সেই ফুটফুটে একরত্তী মেয়ে "তুষার কন্যা" একটু একটু করে বড় হয়ে উঠ্চে। আর, তার রূপও বাড়চে সেই সঙ্গে। যখন সে সাত বছরেরটি হল, তখন তাঁকে দেখতে হল, সুন্দরীর মধ্যে সুন্দরী।

তখন রাণী একদিন আয়নাখানিকে জিগ্যেস করলেন, "বলতো আমাদের মধ্যে বেশি সুন্দরী কে?"

সে বললো, "এক সময়ে রাণী তুমি ছিলে। এখন সবার সেরা সুন্দরী, তুষার কন্যা।"

আয়নার উত্তর শুনে রাণী এমন বিরক্ত হলেন যে, হিংসেয় তাঁর মুখ-চোখ হল্‌দে হয়ে গেল। তখন থেকে "তুষার-কন্যাকে" দেখলেই তাঁর মন হয়ে উঠতে লাগলো পাথরের মতো কঠিন। তিনি তাকে ঘৃণা করতে লাগলেন।

হিংসেয় তাঁর বুক জ্বলে যেতে লাগলো, রাগে কতদিন ভেতরে ভেতরে পুড়তে লাগলেন। দিনে নেই শান্তি, রাতে নেই ঘুম, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। শেষে আর থাকতে পারলেন না।

একদিন এক ব্যাধকে ডেকে বললেন, "ঐ মেয়েটাকে বনে নিয়ে যাও। ওকে আমি আর দেখতে চাই না। ওকে সেখানে কুচি কুচি করে কেটে ওর হৃদ্‌পিণ্ড আর জিভটা এনে আমায় দেখিও।"

ব্যাধ রাণীর কথায় তুষার-কন্যাকে নিয়ে বনে চলে গেল। কিন্তু তাকে কাটবার জন্য কোমর থেকে তলোয়ার খুলতেই তুষার-কন্যা কেঁদে ফেল্‌লো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, "ওগো ব্যাধ, আমায় কেটো না। আমি এই বনের মধ্যে চলে যাব, আর ফিরে আসবো না।"

ব্যাধের মন কঠোর। তবুও তুষার-কন্যার কথায় দয়ায় গলে গেল। তার রূপে সে মুগ্ধ হল। হাত আর উঠলো না; বললো, "তাহলে পালাও বাছা।" কিন্তু মনে মনে বললো, এখনই নেকড়ে বাঘের পেটে যাবে।"

কিন্তু তার মনে হতে লাগলো, তার বুকের ওপর থেকে

যেন একখানা ভারী পাথর নেমে গেল। কারণ, অমন সুন্দরী মেয়েকে তার নিজের হাতে কাটতে হল না। ঠিক তখনই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তার সামনে ছুটে এল একটা বুনো শূয়র। ব্যাধও তৎক্ষণাৎ তাকে তাড়া করলো। এক জায়গায় গিয়ে তাকে শিকার করে তার জিভ ও হৃদ্‌পিণ্ড কেটে নিয়ে রাণীকে দেখাতে গেল তুষার-কন্যার হৃদ্‌পিণ্ড আর জিভ্ বলে।

বেচারী তুষার-কন্যা একা পড়ে রইলো বনে। তার মা নেই, কেউই নেই। দুঃখে তার বুকখানি ভেঙ্গে যাচ্ছে। চারিধারে গভীর বন—বড় বড় গাছ—মোটা মোটা লতা। সে বনের দিকে তাকায় আর কেমন যেন হয়ে যায়। সে ভেবে পায় না যে কোন দিকে যাবে। তারপরই সে দিল এক ছুট্। পাথরে তার নরম তুলতুলে পা দুখানি যায় কেটে, কাঁটা যায় ফুটে। বনের পাতায়, ঘাসের আগায় লাগে রক্ত। চারধার থেকে হিংস্র জন্তরা গর্জন করে ওঠে। কিন্তু কেউ তার কাছে আসে না, তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে, ছুট্‌তে ছুট্‌তে তার পা দুখানি অবশ হয়ে এল, এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। এমন সময়ে, সে দেখতে পেল সামনে একখানি ছোট্ট বাড়ি। সে গিয়ে ঢুক্‌লো সেই বাড়িতে।

এখন, তার ভেতর যা কিছু ছিল সবই ছোট। কিন্তু সবই এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে যে কথায় বলা যায় না। যে ঘরে সে ঢুকেছিল, তার মাঝখানে ছিল একখানি ছোট্ট টেবিল। টেবিলখানি ঢাকা ছিল দুধের মতো সাদা একখানি কাপড় দিয়ে। টেবিলের ওপর সাজানো ছিল সাতখানি ছোট

প্লেট। প্রত্যেক প্লেটের ওপর ছিল একখানি করে ছুরি ও একটি করে কাঁটা। প্লেটগুলোর পাশে ছিল একটি করে মগ। আর ছিল দেওয়ালের ধারে পরিষ্কার করে পাতা পাশাপাশি সাতটি ছোট ছোট বিছানা। প্রত্যেকটি বিছানা ছিল বকের পাখার মতো সাদা একখানি করে চাদর দিয়ে ঢাকা। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তুষার-কন্যা একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক প্লেট থেকে একটু করে রুটি ও মাংস এবং প্রত্যেক মগ থেকে এক ঢোক করে জল সে খেয়ে ফেলল কারণ, অন্য একজনের সবটুকু খাবার খেতে তার মন চাইল না।

হাঁটতে হাঁটতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। খাবার পর আর বসতে পারলো না, একটি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পডলো। কিন্তু বিছানাটি তার মনের মতো হল না। সে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল অন্য আর একটিতে। সেটি হল খুব লম্বা। চতুর্থটি হল খুবই ছোট। পঞ্চমটি হল খুব শক্ত। আবার ষষ্ঠটি হল বড়। কিন্তু সপ্তমটি হল ঠিক। সে চাদরখানি গায়ে দিয়ে তার ওপরই পড়লো ঘুমিয়ে।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন খুব ঘন হয়ে এসেচে, বাড়ির মালিকেরা এল বাড়ি। সাতটি বামন তারা। তারা পাহাড় খুঁড়ে সোনা- রূপো বার করে।

তারা ঘরে ঢুকে প্রথমে সাতটি আলো জ্বাল্‌লো এবং তৎক্ষণাৎ দেখতে পেল, বাড়িতে কে যেন এসেছে। কারণ, যে-ভাবে সব জিনিস রেখে গিয়েছিল সে-ভাবে সব নেই।

প্রথম বামনটি বললে, "আমার চেয়ারে কে বসেছিল ?"

দ্বিতীয়টি বললে, "আমার প্লেট থেকে কে খেয়েছে ?"

তৃতীয়টি বললে, "আমার রুটিখানায় কামড় দিয়েছে কে ?"
চতুর্থটি জিগ্যেস করলে, "আমার প্লেট থেকে মাংস কে খেয়েছে ?"
পঞ্চমটি বললে, "আমার কাঁটা ঘাঁটছিল কে ?"
ষষ্ঠটি বলে উঠলো, "আমার ছুরি দিয়ে কে কাটছিল ?"
সপ্তমটি বললে, "আমার মগ দিয়ে জল খাচ্ছিল কে ?"

তারপর প্রথমটি চারধারে তাকিয়ে বললে, "আমার বিছানায় কে শুয়েছিল !"

তার বিছানার চাদরখানি ছিল গোটানো।

তার কথা শুনে আর সকলে এসে নিজেদের বিছানার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আমাদের বিছানায় কে যেন শুয়েছিল।"

কিন্তু সপ্তম বামনটি তার ধারে গিয়ে দেখলো, তার ওপর তুষার-কন্যা ঘুমোচ্ছে। সে তার সাথীদের ডাক্‌লো। তারা অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠলো এবং সাতজনের হাতের সাতটি আলো তুলে ধরলো। আর, সেই সাতটি আলোর আলো গিয়ে পড়লো তুষার-কন্যার ঘুমন্ত মুখখানিতে। তারা বলে উঠলো, "আহা ! কি সুন্দরী !"

সাতজনে এমন খুশি হল যে, তাকে আর জাগালো না। সাতজনে খেয়ে-দেয়ে ছটি বিছানায় ভাগাভাগি করে ঘুমোলো। এই ভাবে রাত কেটে গেল।

ভোরের আলো ফুটতেই তুষার-কন্যার ঘুম গেল ভেঙে। কিন্তু সাতটি বামনকে দেখে তার ভয় করতে লাগলো। তারা কিন্তু তাকে আদর করে নাম জিগ্যেস করলে।

সে বললে, "আমার নাম তুষার-কন্যা।"

—"তুমি আমাদের কুঁড়েতে এসেছো কেন?"

তুষার কন্যা তার দুঃখের কাহিনী বললে। সে তাদের বললে, কেমন করে তার সৎমা এক ব্যাধের হাতে তাকে দিয়েছিলেন কেটে ফেলতে, কেমন করে ব্যাধটি তাকে ছেড়ে দিয়েছে; তারপর কেমন করে সে এসে পড়েছে সেখানে।

তার কাহিনী শেষ হতেই বামনেরা বললে, তুমি আমাদের ঘর-সংসার দেখবে, আমাদের রান্না করে দেবে, বিছানা পাতবে, কাপড়-চোপড় কাচবে সেলাই করবে, সবকিছু গোছ-গাছ করে রাখবে? যদি রাজী হও, আমরা তোমায় এখানে থাকতে দেব। তোমার কিছুরই অভাব হবে না।"

তুষার-কন্যা বলল, "আচ্ছা।"

তারপর থেকে সে তাদের ঘর-সংসার দেখাশোনা করতে লাগ্‌লো। দিনের বেলা সাতটি বামন যায়, পাহাড়ে সোনা খুঁড়তে তুষার-কন্যা তখন থাকে একা। তাই যাবার সময় তারা বলে যায়, "সাবধান, তোমার সৎমা শিগ্‌গিরই জানতে পারবেন তুমি এখানে রয়েছ। কাড়কে ঘরে ঢুকতে দিও না।"

(২)

এদিকে রাণী মনে করলেন, তিনি বুঝি তার সতীনের মেয়েটির হৃদ্‌পিণ্ড আর জিভটাই খেয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁর মতো সুন্দর পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আবার একদিন তাঁর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, "বল তো আয়না, আমাদের মধ্যে সুন্দরী কে?"

আয়না জবাব দিলে, "তুমি সুন্দরী ছিলে। এখন সবার

চেয়ে সুন্দরী তুষার-কন্যা। সে থাকে ঘন সবুজ বনে, বামনদের সঙ্গে পাহাড়গুলোর মধ্যে।"

শুনে রাণী খুব রেগে গেলেন। বুঝলেন, ব্যাধ তাঁকে ঠকিয়েছে। তুষার-কন্যা এখনও বেঁচে আছে! ভাবতে লাগলেন, কি করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু ভেবে ভেবে কূল-কিনারা কিছুই পান না। যতক্ষণ না তিনিই সবচেয়ে সুন্দরী হচ্ছেন ততক্ষণ মনে আর শান্তি নেই। হিংসেয় বুকের ভিতরটা জ্বলেপুড়ে কালো হতে থাক্‌বে।

অবশেষে তাঁর মাথায় এক মতলব এল। তিনি মুখে রঙ মেখে বুড়ী ফেরিওয়ালী সাজলেন, যাতে কেউ তাকে চিন্‌তে না পারে। এই বেশে তিনি সেই পাহাড় সাতটি পেরিয়ে বামনের সেই ছোট্ট বাড়িখানিতে গিয়ে দরজায় দিলেন ঘা, আর বলতে লাগলেন, "চাই গো, সওদা চাই, ভাল ভাল জিনিষ আছে। চুড়ি আছে, মাকড়ি আছে। চাই গো—"

তুষার-কন্যা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে বললে, "কি এনেছো গো?'

"ভাল ভাল জিনিষ। হরেক-রঙের কাঁচুলি।" এই বলে রাণী নানা-রঙের রেশম দিয়ে তৈরী একজোড়া কাঁচুলি তুলে দেখালেন।

তুষার-কন্যা ভাবলে, স্ত্রীলোকটি ভালমানুষ। ওকে ভেতরে আনা যাক। এই ভেবে সে দরজার খিল খুলে তাঁকে ভেতরে এনে একজোড়া কাঁচুলির দর করতে লাগ্‌লো।

বুড়ী ফেরিওয়ালী বললে, "এস, আমি তোমায় কাঁচুলিটা পরিয়ে বেঁধে দি।"

তুষার-কন্যা তার মতলব বুঝতে পারলে না। বুড়ীর কথায়

রাজী হল। বুড়ী তাকে তাড়াতাড়ি এমন জড়িয়ে বাঁধলে যে, তার দম বন্ধ হয়ে গেল। তুষার-কন্যা মরার মতো মাটিতে পড়ে গেল। রাণী এক ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, "এখন আমি আবার হলাম সবার চেয়ে সুন্দরী।"

তিনি চলে যাবার একটু পরেই সন্ধাবেলায় সাত বামন ঘরে ফিরে এল। কিন্তু তুষার-কন্যাকে অসাড়ভাবে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে সারা হল। সকলে মিলে তাকে তুলতেই দেখলে, তার কাঁচুলিটা খুব এঁটে বাঁধা রয়েছে। তখন তাঁরা টুক্‌রো টুক্‌রো করে সেট কেটে ফেললো। তারপরই তুষার-কন্যার একটু একটু করে নিশ্বাস পড়তে লাগলো এবং একটু করে জ্ঞান ও গায়ে জোর ফিরে এল।

বামনেরা তার মুখে সব কথা শুনে বললে, "সেই বুড়ী ফেরিওয়ালীটা তোমার সৎমা ছাড়া আর কেউ নয়। সাবধানে থাকবে। আমরা যখন থাক্‌বো না, তখন কাউকে এখানে ঢুকতে দিও না।"

ইতিমধ্যে রাণী বাড়ি গিয়ে তাঁর আয়নাখানির সামনে দাঁড়িয়ে আয়নাকে উদ্দেশ্য করে আবার সেই কথাগুলো বল্‌লেন।

আয়না বললে, "তুষার-কন্যা সব চেয়ে সুন্দরী। সে আছে বনে বামনদের সঙ্গে।"

তার কথা শেষ হতেই রাণীর মুখ-চোখ রাগে রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। তিনি মনে মনে বললেন, "এবার আমি এমন ফন্দি করবো যাতে ও একেবারে মরে যাবে।"

এই না বলে, তিনি তৈরি করলেন একখানি বিষের চিরুনি। তারপর ধরলেন এক বুড়ী বিধবার বেশ। তারপর সাতপাহাড়

পেরিয়ে সেই বামনদের দরজায় গিয়ে আবার ঘা দিলেন আর বললেন, "ভাল ভাল জিনিষ বিক্রি—"

তুষার-কন্যা বললে, "তুমি বাপু এখান থেকে যাও। আমি তোমার এখানে ঢুকতে দিতে পারবো না।"

বুড়ী বিষের চিরুনিখানা বার করে তার চোখের সামনে তুলে ধরে বললে, "না নাও না নেবে। একবার দেখ।"

চিরুনিখানা দেখেই মেয়েটির মন গেল ভুলে। সে দরজা খুলে দিলে। সে দরদস্তর করে চিরুনিখানা কিনতেই বুড়ী বললে, "দেখি আমি ঠিক করে তোমার চুল আঁচড়ে দি।"

তুষার-কন্যা রাজী হ'ল। কিন্তু বুড়ী চিরুনিখানা তার মাথায় ছোয়াতেই বিষের কাজ হল সুরু। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

তাই দেখে দুষ্টু রাণী বলে উঠলেন, "এবার তোর দফা রফা"—বলেই তিনি ঘর থেকে গেলেন বেরিয়ে।

কপাল ভাল যে, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সাত বামন ফিরে এল। তারা তুষার-কন্যাকে মেঝেয় আবার মরার মতো পড়ে থাকতে দেখে রাণীর ওপর সন্দেহ করলে। তার পরই বিষের চিরুনিখানা দেখতে পেয়েই টেনে বার করে ফেললো। মেয়েটি সেরে উঠলো এবং তাদের কাছে সব কথা বলতেই তারা আবার সাবধান করে দিল।

রাণীও বাড়ী পৌঁছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার জিগ্যেস করলেন সেই কথা। আয়নাও আবার সেই উত্তর দিল। এই শুনে রাণী রেগে কাঁপতে লাগলেন। হিংসেয় তাঁর বুকখানা জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগ্‌লো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন তাকে মেরে ফেল্‌তে গিয়ে যদি তাঁর প্রাণও যায়, যাক্। তারপর তিনি গিয়ে

ঢুকলেন, একখানি গুপ্ত ঘরে। তার ভেতর আর কেউই ঢুকতে পেত না। তার ভেতর তিনি খুব তীব্র বিষ দিয়ে তৈরি করলেন একটি আপেল। বাইরে থেকে সেটা দেখতে হল চমৎকার, লাল টুকটুকে। দেখলেই জিভে জল আসে। কিন্তু তার একটুখানি মুখে দিলেই মৃত্যু নির্ঘাত।

আপেলটি তৈরি করে রাণী মুখে রঙ মেখে চাষী-বউ সেজে সাত পাহাড়ের ওপারে গেলেন সেই বামনদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দরজায় ঘা দিতেই তুষার-কন্যা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, "আমি কাউকেই ভেতরে আসতে দিতে পারবো না বাছা। সাত বামনে আমায় বারণ করে গেছে।"

বুড়ী বললে, "আমি বড় গরিব। আমার বড় কষ্ট। আপেলগুলো বেচতে না পারলে আরও কষ্ট হবে। আচ্ছা, তা হোক তবু তোমায় একটা দিই। তুমি খাও।"

তুষার-কন্যা বললে, "না বাছা, আমি নিতে পারবো না।"

চাষী-বউ বললে, "কেন ভয় পেলে? এই দেখ আমি একটাকে দুভাগ করে কাটছি। আমি খাই এর ভেতরটা, তুমি খাও এর লাল দিক।"

আপেলটি এমন কৌশল করে তৈরি হয়েছিল যে, সেই লালদিকেই ছিল বিষ। দেখামাত্রই তুষার-কন্যারও আপেলটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সে বুড়ীকে ভেতরের শাঁস থেকে খেতে দেখে লোভ আর সামলাতে পারলে না, হাত বাড়িয়ে নিলে সেই লাল দিকটা।

তারপর তাতে কামড় দিতে না দিতেই মরে মেঝেয় পড়ে গেল। তাই দেখে রাণীর চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসলেন আর বললেন,

"তুষারের মতে সাদা, রক্তের মতো লাল ও আবলুসের মতো কালো চুল। বামনেরা আর তোমায় জাগাতে পারবে না।"

রাণী রাজবাড়ীতে পৌঁছে আবার আয়নাকে জিগ্যেস করলেন, "সব চেয়ে সুন্দরী কে?"

আয়না বললে, "রাণী তুমি।"

তখন তাঁর হিংসুটে মন স্থির হল। হিংসুটে মন যেমন শান্তি পেল, তেমনি শান্তও হল।

সন্ধ্যায় বামনেরা ফিরে এসে দেখলে, তুষার-কন্যা মেঝেয় পড়ে আছে; তার দেহে প্রাণ নেই, যেন সে মরে গেছে। তারা তাকে তুলে খুঁজতে লাগ্‌লো বিষাক্ত যদি কিছু পায়।

তার জামা দিল খুলে, চুল দিল এলিয়ে। তারপর তাকে জল ও সুরায় মিশিয়ে দিল নাইয়ে। তবুও কিছুই হল না। তাদের আদরের মেয়েটি সত্যিই মারা গেছে।

তারা তাকে একটি বিছানায় শুইয়ে তাকে ঘিরে গভীর দুঃখে কাঁদতে লাগ্‌লো। তিন দিন তিন রাত তাদের কান্নার আর বিরাম রইলো না।

তারপর তারা তাকে কবর দেবার আয়োজন করলে। কিন্তু মেয়েটির চেহারা এমন তাজা, জীবন্ত মানুষের মতো তাকে দেখতে, গাল দুখানি ছিল এমন লাল যে, তারা বলাবলি করতে লাগলে, "ওকে আমরা কালো মাটিতে কবর দিতে পারবো না।"

তাই তারা স্ফটিকের মতো একটি কফিন তৈরী করলো যাতে দেহটি তার মধ্যে রাখলে বাইরে চারধার থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর তারা বাক্সটার গায়ে সোনালি অক্ষরে তার নামটি লিখলে আর লিখলে যে, সে ছিল এক রাজকুমারী।

তারপর সেই স্ফটিকের কফিনটি একটি পাহাড়ের থাকে রেখে একজন করে বসে সব সময় তার ওপর নজর রাখতে লাগ্‌লো।

এমন কি বনের পশু-পক্ষীরাও তুষার-কন্যার জন্য কাঁদতে লাগ্‌লো। প্রথমে এল একটি পেঁচা, তারপর এল একটি দাঁড়কাক। সবার শেষে এল একটি ঘুঘু। তার কান্নায় বন ছাপিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

অনেক দিন ধরে তুষার-কন্যা সেই স্ফটিকের কফিনে শান্ত হয়ে শুয়ে রইলো। তার চেহারা একটুও বদলালো না, যেন সে ঘুমোচ্ছে। সে তখনও ছিল তেমনই তুষারের মতো সাদা, রক্তের মতো লাল, আর তার মাথার চুলগুলো ছিল আবলুষের মতো কালো। এমনিভাবে যায় দিন, যায় রাত। তুষার-কন্যা তেমনই শুয়ে আছে, স্ফটিকের কফিনে।

এমন সময় এক রাজকুমার সেই বনের মধ্যে দিয়ে একদিন যেতে যেতে বামনদের বাড়ীতে এল রাত কাটাতে।

সে পাহাড়ের থাকে সেই স্ফটিকের কফিনটি দেখতে পেল। দেখলো তার ভেতরে শুয়ে আছে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে। বাক্সটির গায়ে যে সোনালি লেখা ছিল সেটিও পড়লো; পড়ে বামনদের বললে, "আমাকে এই কফিনটি দাও। এটির জন্য তোমরা যা চাও তাই দেব।"

কিন্তু বামনরা বললে, "পৃথিবীতে যত সোনা আছে সব দিলেও আমরা ওটা বেচবো না।"

রাজকুমার বললে, "কফিনটি আমায় দান কর। কারণ তুষার-কন্যাকে না পেলে আমি বাঁচবো না। আমি যতকাল বাঁচবো ওকে আগলে রাখবো, সম্মান করবো।"

বামনেরা যখন বুঝলে, রাজকুমার মনের কথাই বলছে তখন তাদের মনে বড় দয়া হল। তারা তাকে কফিনটি দিল।



"পৃথিবীতে যত সোনা আছে সব দিলেও আমরা ওটা বেচবো না।"

রাজকুমার তার অনুচরদের হুকুম দিল, কফিনটি সাবধানে কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে।

সকলে কফেনটি কাঁধে তুলে নিয়ে চললো। তারা চলেছে। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ একটা ইঁদুর ছুটে এল বাহকদের সামনে। তারা হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে রয়ে গেল। কিন্তু সেই ঝাকুনিতে তুষার-কন্যার মুখ থেকে আপেলের টুকরোটা বেরিয়ে গেল পড়ে। আর সে চোখমেলে তাকিয়ে স্ফটিকের কফিনটির ডালাটি তুলে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে, "আমি কোথায় ?"

রাজকুমার আনন্দে বলে উঠলো, "ভয় নেই। তুমি আমার সঙ্গে রয়েছো।" তারপর তুষার-কন্যাকে বললে, সে তার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছে। তুষার-কন্যা ছাড়া আর কাউকেই সে বিয়ে করবে না। তারপর বললে, "চল আমার বাবার রাজবাড়িতে "

তুষার-কন্যা তাতে রাজী হল। তারপর সেখানে পৌঁছে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কত দেশের কত লোক এল নিমন্ত্রণে। রাজা-মহারাজারাও সব এলেন। তুষার-কন্যার সৎমায়েরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

তিনি ভাল পোশাক পরে সেজে-গুজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে জিগ্যেস করলেন, "বল তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে ?"

"রাণী, আগে ছিলে তুমি, এখন হল রাজকুমারের কনে "

এই কথা শুনে রাণীর এত কষ্ট হল যে, তিনি কি করবেন ভেবে পেলেন না। প্রথমে ঠিক করলেন, বিয়েতে যাবেন না, কিন্তু শেষে কনেটি দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে বিয়েতে গেলেন।

গিয়ে নতুন রাণীকে দেখেই তুষার-কন্যা বলে চিনতে পারলেন। কিন্তু রাগে, বিস্ময়ে তিনি এমন হয়ে গেলেন যে সেখান থেকে নড়তেই পারলেন না। এদিকে তুষার-কন্যা রাজকুমারকে রাণীর দুর্ব্যবহারের সমস্ত কাহিনী বলেদিয়েছিল। রাজকুমার সেই কথা শুনে অবধি এর প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষা কচ্ছিল। রাণী বিয়ের নেমন্তন্নে গেলে, আগুনে পুড়িয়ে লাল টকটকে করে একজোড়া লোহার জুতো চিমটেয় ধরে এনে রাণীর সামনে রাখা হল। তারপর জুতোজোড়া তাঁকে পরতে বাধ্য করা হল। রাণী সেটা পরে নাচতে নাচতে গেলেন মরে। তুষার-কন্যা বেশ সুখে শান্তিতে কাটাতে লাগলেন।

বনের রাজা



অনেক কাল আগে, মনেই পড়ে না কতকাল আগে, তখন আমাদের ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা, তাঁদেরও মহাঠাকুরদাদারা জন্মাননি, সেই কালে একটি অতি দুঃখী লোক আর তার স্ত্রী থাকতো। তাঁদের একটি মাত্র ছেলে ছিল। কিন্তু একমাত্র ছেলের যেমন করা উচিত সে বুড়ো বাপমায়ের ওপর তেমন ব্যবহার করতো না।

সে এত কুড়ে আর জড় ছিল যে কি বলবো। সে কিছুই করতো না। এমন কি কূয়া থেকে জল তুল্‌তো না। সারাদিন কেবল শুয়ে থাকতো আর গড়াতো। মা তাকে খেতে দিলে খেত, না দিলে খেত না।

ছেলেটির জন্য বাপ-মায়ের মনে ছিল বড় দুঃখ। তারা বল্‌তো "তোকে নিয়ে আমরা কি করি বল্‌তো? তুই তো কোন কাজেরই নয়। আর সবায়ের ছেলেরা বুড়ো বাপ-মাকে কত সাহায্য করে,

খাওয়ায় পরায়, কিন্তু তুই হচ্ছিস্ একটা আহাম্মক। শুয়ে শুয়ে কেবল আমাদের রুটি ধ্বংস করিস্। কিন্তু এ কথায়ও কোন কাজ হল না। ছেলেটা তেমনই কুড়ে হয়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লো।

তাতে বুড়োবুড়ী কি আর করে? তারা ছেলের জন্য ভাবে আর চোখের জল ফেলে।

শেষে তার মা একদিন তার বাবাকে বললে, "ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায়? তুমি তো দেখতে পাচ্ছো, ও বড়-সড় হয়েছে অথচ আমাদের কোন কাজে লাগছে না। ছেলেটা এত বোকা যে ওকে দিয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না। দেখ ওকে কোথাও পাঠিয়ে কিছু করানো যায় কিনা। আমরা যতটুকু পারলাম অন্য লোকে হয়তো ওকে দিয়ে এর চেয়ে বেশিই করাতে পারবে।

তাই তার বাপ-মা পরামর্শ করে তাকে দর্জির কাছে পাঠালো দর্জির কাজ শিখতে। সেখানে থাকলো তিনদিন। তার পরের দিন পালিয়ে বাড়ি এলো। তারপর আবার তেমনই কুড়ের মতো বসে রইলো। তার বাপ-মা তখন তাকে বেশ ঘা-কতক দিয়ে এক মুচির কাছে পাঠালো জুতো শেলাই করা শিখতে।

কিন্ত সে আবার পালিয়ে বাড়ি এল। তার বাবা তাকে আবার বেশ করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পাঠালে কামারের কাজ শিখতে। কিন্তু সেখানেও সে বেশিদিন থাকলো না, আবার পালিয়ে বাড়ি এল।

এখন, তার বাবা ভেবে পেলো না, তাকে নিয়ে কি করবে। বলল, "এই কুড়ে ছেলে! তোকে নিয়ে আমি কি করবো বলতো! কুড়ে সর্দার কোথাকার! চল্, তোকে নিয়ে যাবো অন্য রাজ্যে। সেখানে হয়তো লোকে এখানকার চেয়ে ভাল শিক্ষা দিতে

পারবে। এত দূর দেশে নিয়ে যাবো যে সেখান থেকে তুই পালিয়ে বাড়ি আসতে পারবি না।"

তাই তার বাবা তাকে নিয়ে একদিন বাড়ি থেকে রওয়ানা হল।

(২)

তারা দুজনে চলেছে। চলতে চলতে ছোট-বড় কত পথ পার হয়ে গেল। শেষে পেঁছিল এক অন্ধকার বনে। সে বন এমন অন্ধকার যে, না দেখা যায় আকাশ, না দেখা যায় মাটি। তারা দুজনে চললেন সেই বনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কিছুদূর চলেই একজায়গায় দুজনে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লো!

সেখানে ছিল একটা সরু পথ। পথটা শেষ হয়েছিল একটা ছোট ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটাতে ছিল কতকগুলো গাছের ভাঙা গুঁড়ি খোঁটার মতো খাড়া হয়ে। বৃদ্ধ বললে "আমি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, এখানে একটু বিশ্রাম করবো।"

গুঁড়ির ওপর বসেই বৃদ্ধ বলে উঠলো, "ও, কি রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সেই গুঁড়িগুলোর মাঝ থেকে বেরিয়ে এল, ছোট্ট এক বুড়ো। তার মুখের চামড়া এমন কোঁচকানো আর বাঁকাচোরা যে কি বলবো! তার দাড়িটা এমন সবুজ আর এত লম্বা যে হাঁটু অবধি পড়েছে। সে জিগ্যেস করলে, "বাপু তুমি আমার কাছে কি চাও?"

ছেলেটির বাবা তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে, "আমি তো তোমায় ডাকি নি। চলে যাও!"

ক্ষুদেবুড়ো বললে, "আমায় ডাকলে আবার এমন কথা বলছো !

ছেলেটির বাবা জিগ্যেস করলে, "তুমি কে ?"

ক্ষুদেবুড়ো বললে আমি বনের রাজা—ও ; তুমি কেন আমাকে ডেকেছো, অ্যাঁ ?"

ছেলেটির বাবা বললে, "চলে যাও, আমি তোমায় ডাকিনি।"

"কি তুমি যখন 'ও' বলেছো তখনই তো আমায় ডেকেছো।"

আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই বলেছিলাম 'ও' !

ও জিগ্যেস করলে, "তোমরা কোথায় যাচ্ছো ?"

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "চলেছি দুনিয়ার পথে। আমার এই আহাম্মক ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি যদি কেউ ওকে কাজে লাগায়। হয়তো অন্য লোকে ওর চৈতন্য উদয় করতে পারে। আমরা তো বাড়িতে কিছু করতে পারলাম না। যেখানেই পাঠিয়েছি সেখান থেকেই ছেলেটা পালিয়ে এসেছে।"

ও বললে, "ছেলেটাকে আমার কাছে রাখো। কথা দিচ্ছি, আমি ওকে শিক্ষা দেব। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে তোমার ছেলেটিকে নেবো। সেটি হলো এই যে, আজ থেকে এক বছর পরে তুমি ওকে নিতে আসবে। তখন যদি ওকে নিতে পারো তবেই নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি না চিনতে পারো, ছেলেটা আর এক বছর আমার কাজ করবে।"

লোকটি বললে, "বেশ কথা।"

লোকটি ছেলেকে রেখে বাড়ির দিকে ফিরলো; আর ও ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল।

(৩)

ও ছেলেটিকে নিয়ে চললো। তারা হুটিতে চলে গেল অন্য জগতে—মাটির তলায়।

সেখানে তারা গেল একখানি সবুজ নলখাগড়ার তৈরী কুঁড়ে ঘরে। সেই কুঁড়ের মধ্যে যা কিছু ছিল সবই সবুজ। দেয়ালগুলো সবুজ, বেঞ্চিগুলো সবুজ, ও'র স্ত্রীর রং সবুজ, ছেলে-মেয়েরাও সবুজ। মোট কথা সবকিছুই সবুজ। ও'র বাড়ির দাসী ছিল, জলবালারা। তারাও সবুজ।

ও তার নতুন মজুরকে বললে, "এখন বস। কিছু খাও।

দাসীরা তাকে খাবার এনে দিল। সেগুলোও সবুজ।

ছেলেটি খাবারগুলো খেল।

ও দাসীদের বললে, "আমার এই মজুরটিকে চাতালে নিয়ে গিয়ে কাঠ কাটাও, জল তোলাও।"

তারা ছেলেটিকে চাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু সে কাঠ না কেটে সেখানে শুয়ে ঘুমোতে লাগ্‌লো।

ও দেখতে এল, তার লোকটি কি রকম কাজ করছে। এসে দেখে, সে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ও তখন তার দাসীদের বললে, "কাঠ এনে মজুরটাকে তার সঙ্গে বেঁধে কাঠে আগুন দাও।"

তারা তাই করলে। কাঠে আগুন দেওয়া হল। মজুরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ও তখন সেই ছাইগুলো কুড়িয়ে বাতাসে

উড়িয়ে দিল। কিন্তু ছাইগুলোর মাঝ থেকে একটুকরো কয়লা মাটিতে পড়ে গেল। ও তখন সেই টুকরোর ওপর সঞ্জিবনী জল ছিটিয়ে দিল। তখনই মজুরটি বেঁচে উঠে তার সামনে দাঁড়ালো। তাকে দেখাতে লাগলো আগের চেয়ে আরও বলিষ্ঠ, আরও সুন্দর।

ও তাকে কাঠ কাঠতে বললে। কিন্তু আবার শুয়ে শুয়ে ঘুমোতে লাগ্‌লো। ও তখন আবার তাকে ধরে কাঠের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে ছাইগুলো উড়িয়ে দিল বাতাসে। তারপর সেই অবশিষ্ট কয়লাটুকরোর ওপর আবার সঞ্জীবনী জল ছিটতেই সেই অলস আহাম্মকটার বদলে হল এক লম্বাচওড়া সুশ্রী যুবক। সে এমন লম্বাচওড়া ও সুশ্রী হল যে কেবল গল্পেই তার দেখা মেলে।

তারপর ছেলেটি সেখানে রইলো এক বছর। বছর পরে তার বাবা এল তাকে নিয়ে যেতে।

লোকটি সেই বলে, সেই গাছের গুঁড়িগুলোর কাছে এসে একটা গুঁড়িতে বসে বললে, "ও।"

ও তৎক্ষণাৎ সেই গুঁড়িগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কি হে?"

লোকটি বললে, "এস, এস ও।"

ও জিগ্যেস করলে, "কি চাও?"

লোকটি বললে, "এসেছি আমার ছেলেটিকে নিতে।

"বেশ। তাকে যদি চিন্‌তে পারো নিয়ে যাও। যদি না পারো সে আর এক বছর আমার কাছে থাকবে।"

লোকটি গেল ও'র সঙ্গে। দুজনে এলো সেই কুঁড়েতে ও একমুঠো বাজরা নিয়ে ছড়িয়ে দিল। অমনি ছুটে এল একপাল মুরগী। তারা বাজরাগুলো খুঁটে খেতে লাগলো। ও বললে

"তোমার ছেলেকে আর চিনতে পারো ?" লোকটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো! মুরগী ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই, সবগুলো দেখতে একই রকমের। সে তাদের মধ্য থেকে তার ছেলেটিকে বেছে নিতে পারলো না। ও বললে, "তুমি যখন তাকে চিনতে পারছো না, তখন বাড়ি ফিরে যাও। এ বছর ছেলেটি আমার কাজ করবে।" লোকটি তাই বাড়ি ফিরে গেল।

দ্বিতীয় বছর গেল কেটে। লোকটি আবার গেল ওর কাছে এবং তেমনই উপায়ে ও'র দেখা পেল। ও বললে, "এস, দেখ যদি তাকে এখন চিনতে পারো।" তারপর সে তাকে নিয়ে গেল ভেড়ার গোয়ালে। তার মধ্যে ছিল সারি সারি ভেড়া। সব এক রকমের দেখতে। লোকটি তার ছেলেকে চিনতে না পেরে বাড়ি ফিরে গেল।

তৃতীয় বছরও কেটে গেল। লোকটি আবার তার ছেলেকে আনতে চললো। পথে দেখা হল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। লোকটি তার কাছে নিজের দুঃখের কথা বললে। সন্ন্যাসী বললে, "তুমি এবার এক কাজ করবে। ও যখন এক ঝাঁক ঘুঘু তোমার সামনে ছেড়ে দিয়ে বলবে, "তোমার ছেলেকে চিনে নিয়ে যাও তখন পীচগাছের তলায় বসে যে ঘুঘুটি পালখ সাফ্ করবে তাকেই নিয়ে যেও। সেই তোমার ছেলে।"

লোকটি এবার ও'র কাছে যেতে সে ঠিক তাই করলো। লোকটি পিচগাছের তলায় যে ঘুঘুটি বসে পালখ সাফ করছিল তাকে দেখিয়ে বললে, "ও-ই আমার ছেলে।" ও বললে, "বেশ। ঘুঘুটিকে ধর।" লোকটি ঘুঘুটিকে ধরতেই সে হয়ে উঠলো এক সুন্দর যুবক। সে তখন তাকে নিয়ে বাড়ি চল্‌লো।

পথে দুজনের সুখ-দুঃখের কথা হল। ছেলেটি বললে, "বাবা

তুমি ভেবো না। পথে দেখবে এক জায়গায় কতকগুলি জমিদারের ছেলে শিয়াল শিকার করছে। আমি গ্রে-হাউণ্ডের রূপ ধরে শিয়ালটিকে ধরবো। ওরা তখন আমায় কিনতে চাইবে। তুমি তিন শো টাকায় আমায় বিক্রি করো। কিন্তু দড়িগাছটি ওরা কিনতে চাইলেও বেচো না।"

ছেলেটি যা বললো ঠিক তাই হল। বুড়ো দড়িগাছাটি বেচলো না।

দেখলো কতকগুলো কুকুর একটা শিয়ালকে তাড়া করেছে। কুকুরগুলো শিয়ালের পিছনে ছুটছে কিন্তু তাকে ধরতে পারছে না। তখন ছেলেটি একটি গ্রেহাউণ্ড হয়ে গেল। এক ছুটে গিয়ে শিয়ালটির ঘাড়ে পড়ে তাকে মেরে ফেল্‌লে।

জমিদারছেলেরা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল। তারা লোকটিকে জিগ্যেস করলে, "ওটা কি তোমার গ্রেহাউণ্ড ?"

"হাঁ"

"কুকুরটা ভাল। আমাদের কাছে বেচবে ?"

"দাম কত দেবেন বলুন।"

"তোমার কত দরকার ?"

"শিকল ছাড়া তিনশো টাকা।"

"তোমার শিকল নিয়ে আমরা কি করবো ? আমরা ওকে সোনার শিকল গড়িয়ে দেব। একশো টাকায় রাজি আছ ?"

"না।"

"তাহলে এই তোমার টাকা নাও। কুকুরটা আমাদের দাও" তারা তিনশো টাকা গুনে দিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে শিকারে চলে

গেল। তারা কুকুরটাকে আর একটা শিয়াল শিকার করতে ছেড়ে দিল।

কুকুরটা দিল ছুট। শিয়ালটাকে তাড়া করতে করতে গভীর বনে ঢুকে গেল। সেখানে আবার মানুষ হয়ে তার বাবার কাছে গিয়ে হাজির। সে টাকা ও দড়ি নিয়ে কিছুদূর যেতে যেতেই ছেলেটি মানুষ হয়ে তার কাছে ফিরে এল।

দুজনে আবার চলেছে। তার বাবা বললে, "এ টাকা দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে? আমাদের কুঁড়ে সারিয়ে যে টাকা থাকবে তাতে সংসার খরচই চলবে না। "ছেলে বললে, "দুঃখ করো না বাবা। দেখ, ওই দিকে কয়েকটি জমিদারের ছেলে বাজপাখি দিয়ে কোয়েল শিকার করছে। আমি বাজপাখি হব। তুমি আমাকে ওদের কাছে বেচো। তিন টাকার বেশি বা কম নিও না। কিন্তু মাথার ঢাক্‌নাটা বেচো না। বেচলে আমায় আর ফিরে পাবে না।"

ছেলেটি যেমন বললে, তেমনই হল। তারা বন থেকে বেরিয়ে মাঠে পড়লো।

সেখানে জনকতক জমিদারের ছেলে তাদের বাজপাখিগুলোকে কোয়েলের পিছনে ছেড়ে দিচ্ছিল।

বাজপাখিগুলো উড়তে উড়তে কোয়েলগুলোকে তাড়া করে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই তাদের নাগাল পাচ্ছিল না। কোয়েল কৌশলে তাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিল। ছেলেটি তখন বাজপাখি হয়ে তৎক্ষণাৎ কোয়েলটাকে ঠোঁটে ও নখে ছিড়ে ফেলল।

জমিদারের ছেলেরা তা দেখে অবাক হয়ে গেল।

তারা লোকটিকে বললে, "এটি তোমার বাজপাখি ?"

"হাঁ।"

"তাহলে ওটা আমাদের কাছে বেচো।"

"তোমরা যদি আমাকে তিন শো টাকা দাও তাহলে বেচবো। কিন্তু মাথার ঢাকাটা বেচ্‌বো না।"

"যেন তোমার মাথাঢাকাটা না হলে চলবে না। আমরা ও.ক রাজমুকুটের মতো একটা মাথাঢাকা তৈরি করিয়ে দেবো।"

তারা লোকটির সঙ্গে দরকষাকষি করতে লাগলো।

কিন্তু শেষে তার কথাতেই রাজি হল। তারা বাজপাখিটিকে নিয়ে একটা কোয়েলের পিছনে ছেড়ে দিল।

ছুটিতে চললো পাল্লা।

উড়তে উড়তে বাজপাখি তার শিকারকে মেরে ফেললে। কিন্তু তারপর সে তরুণ যুবক হয়ে তার বাবার কাছে গিয়ে হাজির।

আবার দুজনে চলেছে।

তার বাবা বললে, "এত অল্প টাকায় আমাদের দিন চলবে কি করে ?"

ছেলে বললে, "একটু সবুর কর বাবা। আরও টাকার জোগাড় হবে।" আমরা যখন মেলার মধ্যে দিয়ে যাবো তখন আমি হব—ঘোড়া। তুমি আমাকে বেচো। লোকে আমার দাম দেবে দেড় হাজার টাকা। কিন্ত দড়িগাছটি বেচো না।"

তারা পরের নগরে গিয়ে দেখে, সেখানে একটি মেলা বসেছে। ছেলেটি ঘোড়া হয়ে গেল। তেমন ঘোড়া কেউ কখন দেখেনি। ঘোড়াটা সাপের মতো নমনীয়, কিন্ত আগুনের মতো তেজী। তার কাছে যেতেই ভয় করে। লোকটি দড়ি ধরে ঘোড়াটিকে নিয়ে

চললো। তার ক্ষুরের আঘাতে পাথর থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগ্‌লো। ঘোড়া ব্যবসায়ীরা তার কাছে দর দাম শুরু করে দিল। লোকটি বললে, "হাজার টাকা। হাজার টাকায় ওকে বেচতে পারি। তবে দড়িগাছটি বেচবো না।"

তারা বললে, "তোমার দড়িটাকে আমাদের কি দরকার?"

আমরা সোনারূপো বসানো দড়ি দেবো ওকে। এখন কাজের কথা বল। আমরা দেবো পাঁচ শো টাকা।"

লোকটি বললে, "না।"

তখন সেখানে এল এক কানা বেদে। সে বললে, "বাপু, ঘোড়াটার জন্যে কত চাও?"

"দড়ি ছাড়া হাজার টাকা।"

"কিন্তু বাবা, দামটা হল একটু চড়া। দড়িসমেত পাঁচশো টাকা হবে না?"

"না।"

তাহলে ছশো টাকা নাও "বলে বেদে দরকষাকষি শুরু করলে। বললে, "তাহলে দড়িসমেৎ বেচো।"

"না গো বাপু। দড়িগাছটি আমার ভারী পছন্দ।"

"কিন্তু ভালমানুষের পো! কোথায় দেখেছো যে দড়িছাড়া ঘোড়া বিক্রি হয়? দড়ি না থাকলে ওকে নিয়ে যাবো কি করে?"

"তা হোক। দড়িটা আমার থাকবে।"

দেখ বাবা, তোমাকে আরও পাঁচটাকা বেশি দেবো। দড়িগাছটি আমার চাই-ই।"

বুড়ো ভাবতে লাগলো। "এই রকম এক গাছা দড়ির দাম ছ'গণ্ডা পয়সা। কিন্তু বেদেটা আমাকে দিতে চাইছে পাঁচটাকা।

আচ্ছা। বুড়ো রাজি হল। টাকাগুলো নিয়ে সে খুশী হয়ে বাড়ি চল্‌লো, আর বেদেটা চলে গেল ঘোড়াটা নিয়ে। সে কিন্তু আসলে বেদে নয়। সে হল বনের রাজা, ও। ও বেদের রূপ ধরে ছিল।

(৪)

ও চললো ঘোড়াটির পিঠে চড়ে। ঘোড়াটা তাকে নিয়ে ছুটলো বনের গাছপালার ওপর দিয়ে ; আকাশের মেঘের তলায় তলায়। শেষে তারা বনের মধ্যে গিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে পেঁছিলো। ও তাকে বাইরে মাঠে ছেড়ে রাখলো। তার স্ত্রীকে বললে, "এবার ওই বাচ্ছাটা সহজে আমার হাত থেকে পালাতে পারবে না।"

সকালে ও ঘোড়াটার রাশ ধরে নিয়ে গেল নদীতে জল খাওয়াতে। কিন্তু ঘোড়াটা জলে মাথা নুইয়ে জল খেতে গিয়েই পারচমাছ হয়ে সাঁতরে যেতে লাগলো।

ও তৎক্ষণাৎ পাইক মাছ হয়ে তার পিছনে তাডা করলো। কিন্ত সে কিছুতেই তাকে ধরতে পারে না।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে পারচমাছটা উঠলো গিয়ে ডাঙ্গায়। তখন সেখানে ছিল এক রাজকন্যা! সে তখন একটা অ্যাশ-গাছের সরু ডাল চাঁছছিল। পারচমাছটা হয়ে গেল একটা মণি-বসানো আংটি।

রাজকন্যা সেটিকে দেখতে পেয়ে কূল থেকে তুলে নিয়ে ছুটলো বাড়ি।

বাড়ি গিয়ে তার বাবাকে বললে, "বাবা দেখ, কি সুন্দর একটা আংটি পেয়েছি।"

রাজা মেয়ের গালে আদর করে দিলেন চুমো।

রাজকন্যা কিছুতেই ঠিক করতে পারে না, আংটিটি সে পরবে কোন আঙুলে।

ঠিক তখনই এক নফর এসে রাজাকে বললে, রাজবাড়িতে এক সওদাগর এসেছে। আসলে সে কিন্তু সওদাগর নয়। ও ধরেছিল সওদাগরের রূপ।

রাজা বাইরে গিয়ে বললেন, "কি চাও বুড়ো সওদাগর ?"

সওদাগর বললে, "মহারাজ, আমি জাহাজে চড়ে যাচ্ছিলাম সমুদ্র দিয়ে। আমার দেশের রাজার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম একটা লাল মণি বসানো আংটি। সেটা আমার হাত থেকে জলে পড়ে যায়। আপনার নফরেরা কেউ কি সেটা পেয়েছে ?"

রাজা বললেন, "না, আমার মেয়ে পেয়েছে।"

নফর গিয়ে রাজকন্যাকে ডেকে নিয়ে এলো।

ও বললে, "রাজকন্যে! আংটিটা আমায় ফিরিয়ে দাও। নাহলে আমার গর্দান যাবে।"

কিন্তু তাতে রাজকুমারীর মন লাগলো না। সে আংটিটা দিতে চাইলো না।

তখন রাজা বললেন, "বাছা আংটিটা ওকে ফিরিয়ে দাও। আমাদের জন্য বেচারা বিপদে পড়বে। দাও তুমি।"

ও বললে, "কন্যে! আর যা চাও দিচ্ছি, আংটিটা তুমি আমায় ফিরিয়ে দাও।"

রাজকন্যা বললে, "আংটিটা তোমার আমার কারোই হবে না।" বলেই সে দু-আঙুলে সেটি ঘুরিয়ে মাটিতে দিল ফেলে।

আংটিটা তৎক্ষণাৎ একমুঠো জোয়ার হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়লো।

ও তখন আর কোন কথা না বলে মুরগী হয়ে খুঁটে খেতে লাগলো। খেতে খেতে, খেতে খেতে সে সবগুলো খেয়ে ফেললো।



ও তখন আর কোন কথা না বলে মুরগী হয়ে খুঁটে খেতে লাগ্‌লো।

কিন্তু একটি ছোট দানা গড়িয়ে গিয়ে রাজকুমারীর ঠিক পায়ের তলায় পড়েছিল। সে সেটাকে দেখতে পেলো না।

সবগুলো খাওয়া হলে, মুরগীটা জানলায় উঠে ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কিন্তু সেই দানাটি হল এক পরম সুন্দর যুবক। এত সুন্দর যুবক যে রাজকুমারী তাঁকে দেখেই ভালোবেসে ফেললো এবং রাজরাণীকে বললে, "আমি ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।"

রাজা মেয়ের কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে ভাবলেন। একটি সাধারণ ছেলের সঙ্গে কি করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন? শেষে মেয়ের কথায় মত দিলেন।

তারপর মহা ধুমধামে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের ভোজে এল কত লোক! আর সে কি খাওয়া দাওয়া! আমিও সে ভোজে ছিলাম। এত খেলাম যে কি বলবো! যা মুখে আঁটে নি তা আমার দাড়ি বেয়ে পড়েছিল। কিন্তু হয়েছিলাম খুব খুশী।

সত্যিকারের রাজকন্যা



অনেক—অনেক দিন আগে ছিল এক রাজপুত্র।

তার ইচ্ছা হয়েছিল, রাজকন্যাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তাহলে তো মেয়েটির সত্যি-কারের রাজকন্যা হওয়া চাই।

কিন্ত যেখানে-সেখানে তো সত্যি কারের রাজকুমারী পাওয়া যায় না। তাই সে তাঁর খোঁজে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু তেমন মেয়ে তার চোখেই পড়লো না। যাঁদের পেল, তাঁদের প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন খুঁৎ আছেই।

রাজকন্যাও সে পেল অনেক। কিন্তু তাঁরা সত্যিকারের রাজকন্যা কিনা তা ঠিক করা তার পক্ষে হল অসম্ভব। তাঁর প্রত্যেককেই বোধ হ'ল, সত্যিকারের রাজকন্যা নয়।

তবে তাঁকে পাওয়া যাবে কোথায়?

সে খোঁজে আর ভাবে। অবশেষে হতাশ হয়ে সে রাজবাড়িতে ফিরে এল।

মনে তার একটুও স্ফূর্তি নেই। রাত্রে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই।

সে চেয়েছিল সত্যিকারের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে। কোথাও কি তার সত্যিকারের রাজকন্যা একটিও চোখে পড়লো!

এমনি দিন যায়। ছেলের মনে সুখ নেই তাই রাজার মনেও সুখ নেই।

তারপর—

এক রাতে উঠলো ভীষণ ঝড়। তেমন ঝড় কেউ কখন দেখে নি।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, গুরু গুরু মেঘ ডাকতে লাগলো, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হতে লাগলো মুষলধারায়।

সব ঢেকে গেল আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে।

এমন সময়ে রাজবাড়ির দরজায় পড়লো ঘা। বুড়ো রাজা, আমাদের রাজপুত্রটির বাবা নিজেই গেলেন দরজা খুলে দিতে।

তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল সত্যিকারের এক রাজকন্যা। ঝড়-বৃষ্টিতে তার অবস্থা একেবারে শোচনীয়। তার মাথার চুলের রাশি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে; পোশাকটা ভিজে গায়ের সঙ্গে গেছে এঁটে। শীতে কাঁপছে!

রাজামশাই তো তাঁকে দেখে অবাক।

সে বললে, "আমি সত্যিকারের রাজকন্যা।"

রাজা বললেন, "ভেতরে এস।"

সে ভেতরে এসে দাঁড়ালো।

রাণীমা তাঁর কথা শুনে মনে মনে বললেন, "আচ্ছা শিগ্গিরই বোঝা যাবে।"

কিন্তু তিনি মনের কথা মনেই রাখলেন; কি যে করতে যাচ্ছেন তা না বলে চুপচাপ চলে গেলেন শোবার ঘরে।

সেখানে গিয়ে বিছানা থেকে চাদরগুলো সব তুলে নিয়ে খাটের ওপর রাখলেন, তিনটি ছোট্ট ছোট্ট মটর। তারপর সেই মটর তিনটির ওপর পাতলেন পর পর বিশখানা তোশক। আর সেই তোশকগুলোর ওপর পর পর পাতলেন, বিশখানি পালকের গদি।

সেটি হল রাজকন্যাটির বিছানা।

রাজকন্যা শুকনো পোশাক পরে, চুল এলিয়ে তাতেই শুয়ে রাত কাটালো।

(২)

ভোর হল।

রাণীমা এলেন। এসে জিগ্যেস করলেন, "কেমন ঘুমোলে?"

রাজকন্যা বললে, "বড্ড কষ্টে। সারা রাতের মধ্যে একবারও চোখের পাতা বন্ধ করিনি। বিছানার তলায় কি যে ছিল জানিনে। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম, নিচে রয়েছে শক্ত মতো যেন কি! তার ফলে আমার সারা গায়ে কালশিরে পড়ে গেছে।"

তখন পরিষ্কার বোঝা গেল, মেয়েটি সত্যিকারের রাজকন্যা। কারণ বিশখানা পালকের গদি আর বিশখানা তোশকের তলায় যে কিছু ছিল তাও সে বুঝতে পেরেছে। সত্যিকারের রাজকন্যা ছাড়া এমন কোমল অঙ্গ কারই বা হয়?

রাজপুত্রও বুঝলে যে, সে সত্যিকারের রাজকন্যার দেখা পেয়েছে। তাই সে তাঁকে বিয়ে করলে।

আর সেই মটর তিনটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হল, যাদুঘরে দ্রষ্টব্য জিনিষের মতো, যদি হারিয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে মটর তিনটি আজও সেখানে আছে।

আচ্ছা, মেয়েটি কি সত্যিই কোমলাঙ্গী নয়?